আপনিও সফল হোন

আপনিও সফল হোন

মূল
ড. করিম আশ শায়লী

অনুবাদ ও সম্পাদনা
সাকিব মাহমুদ

সুজুদ
পাবলিশিং
অন্তহীন জীবনের সন্ধানে

আপনিও সফল হোন

মূল	ড. করিম আশ শায়লী
অনুবাদ ও সম্পাদনা	সাকিব মাহমুদ
প্রথম প্রকাশ	ডিসেম্বর ২০২৫
প্রচ্ছদ	আহমাদুল্লাহ্ ইকরাম
পৃষ্ঠাসজ্জা	মুহারেব মুহাম্মাদ
স্বত্ব	অনুবাদক
প্রকাশক	আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশনা	সুজুদ পাবলিশিং
পরিবেশনা	ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
বিক্রয়কেন্দ্র	দোকান নং ২১, কওমি মার্কেট ১ম তলা, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন: +৮৮০ ১৭৬৮-৮৬৪৪২৮ (সেলস) +৮৮০ ১৭১৬৭-৯৭৫৪৯ (অফিস)
অনলাইন পরিবেশক	rokomari - wafilife
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-২৯৩২৩-৫-৯

মুদ্রিত মূল্য : ৪৪০ ৳

সূচীপত্র

- অনুবাদকের কথা ১১
- প্রকাশকের কথা ১৬
- সূচনা ১৯
- এই বইটা কি পড়ার মতো কিছু? নাকি এমন কিছু পৃষ্ঠা, যেগুলো পুড়িয়ে ফেলাই ভালো? ২১
- লেখক ও প্রকৃত লেখক ২৫
- ভাবনা আসলে এক ধরনের রিজিক ২৭
- আপনার সাফল্যের গল্পগুলো ওদেরকেই বলতে দিন! ৩০
- জীবনটা উপভোগ করুন, অযথা আগুনে পুড়বেন না! ৩৩
- যতটা সম্ভব, শুধু ততটাই করুন, কেউই জীবনের সব কাজ শেষ করে মরেন না! ৩৭
- চলুন, নিজের মৃত্যুসংবাদটা লিখে ফেলি! ৪০
- জীবন কোনো জরুরি অবস্থার নাম নয়! ৪৪
- এই জীবনে আমি অনেক কিছু পেয়েছি! ৪৭
- এই সমাজ, এই পরিবেশ, এই মানুষগুলোই কি আমার ব্যর্থতার মূল কারণ? ৫০
- উদ্ধারকারী নিঃশ্বাস, এক নির্মল প্রশান্তির পাঠ ৫৪
- আলুর থলে বহিও না ৫৮
- বুদ্ধিমান হোন, অতীত থেকে শিখুন ৬১

◈ আপনি সুখী, না অসুখী?..৬৪
◈ সুখের পরিসংখ্যান..৬৫
◈ আমাকে কনস্টান্টিনোপলের মানচিত্র দিন!..৬৭
◈ চলন্ত ট্রেনে ঝাঁপ দিবেন না!...৭০
◈ ঈমান ৭৪
◈ আমাদের বড় করে তোলে বড় ব্যথাগুলোই!......................................৭৬
◈ দরজা খোলা মানে কিন্তু দেয়াল ভেঙে ফেলা নয়! ৭৮
◈ একটি খালি নৌকা ৮১
◈ দেখুন, শিখুন, সমৃদ্ধ হোন! দ্য স্কুল অব অবজারভেশন!............. ৮৩
◈ এই পৃথিবীটা আসলে কার?..৮৭
◈ এটাই যথার্থ সংযম ৯১
◈ একটি স্বপ্ন আপনারও থাকা উচিত!...৯৪
◈ ব্রেন খাটাও ৯৭
◈ হৃদয়ের উষ্ণতায় খুলে যায় মন! ১০১
◈ পাখিদের ভি (V)-আকারে ওড়া, প্রকৃতির অনন্য এক শিক্ষা...... ১০৫
◈ এটি কোনো অলৌকিক গল্প নয়, এটি জীবনের বাস্তবতা!........... ১০৯
◈ আমি আসলে একটু কানে কম শুনি! ১১৩
◈ পৃথিবীটা বদলানো দরকার! ১১৭
◈ উপস্থাপনার পদ্ধতি বদলে ফেলুন, পথ খুঁজে পাবেন ১২০
◈ সন্তুষ্টির আলো, হৃদয়ের ঘরে জ্বলে...১২৪
◈ অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ ১২৬
◈ অন্তরের অগোছালো ভাবনাগুলো ১২৯
◈ ভাগ্যের অপেক্ষায় নয়, পরিশ্রমেই মুক্তি.......................................১৩৩
◈ ছোট ছোট সমস্যা এবং একটি নীরব ধ্বংসের গল্প.................... ১৩৭
◈ একটুখানি আশা!.. ১৪০

◈ জনতার উল্লাস, প্রশংসা এসব তো সাময়িক ১৪৩
◈ জানাশোনার পরিধি বাড়ান ১৪৬
◈ স্বপ্নটা অবশ্যই বড় হওয়া উচিত! ১৫০
◈ হৃদয়ের জান্নাত! ১৫৩
◈ বাহ্যিক সুখে প্রতারিত হবেন না! ১৫৬
◈ আল্লাহর জন্য বাঁচা ১৬০
◈ স্বাধীনতার ভয়! ১৬৪
◈ আপনিও পারবেন! ১৬৮
◈ উদ্বেগকে তাড়িয়ে দিন! ১৭০
◈ টাকার খেলা! ১৭৪
◈ দুনিয়ার বাস্তবতা! ১৭৮
◈ বুঝে শুনে বন্ধু বানান! ১৮২
◈ অসম্ভব নয় আপনিও হতে পারেন কোটিপতি! ১৮৫
◈ সমালোচনা মানেই কি মূল্য কমিয়ে দেওয়া? ১৮৮
◈ বিশ্রাম নেওয়া মানেই কি অলসতা কিংবা দায়িত্বহীনতা?! ১৯২
◈ সুখের পায়রা ১৯৬
◈ ভয়ের চেয়েও ভয়ংকর যেটা! ১৯৯
◈ বেদনাদায়ক পথ ২০৩
◈ আমি তো খুব বুদ্ধিমান নই, আমার তো ভালো সার্টিফিকেট নেই... ২০৬
◈ একটি গোপনীয়তা আপনারও হোক! ২১২
◈ কেন আমি বারবার জীবনযুদ্ধে পড়ি? ২১৬
◈ প্রিয়জনের সাথে মতবিরোধ হওয়া ২২২
◈ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার! ২২৬
◈ প্রশান্তির নির্জনতা! ২২৯
◈ এই অভিনয় বন্ধ করুন! ২৩৩

◈ আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করুন!................................ ২৩৬
◈ ঘুমন্ত ড্রাগন!.. ২৪০
◈ আপনার প্রতিপক্ষ হোক সাহসী কেউ!............................ ২৪৪
◈ আপনি কী রেখে যাচ্ছেন?!..................................... ২৪৬
◈ রাজা নগ্ন ছিলেন! ২৪৯
◈ আপনি হোন ভিন্ন! হোন অনন্য!................................ ২৫২
◈ আশার কুয়ো! যার কোন তল নেই!............................... ২৫৪
◈ তারা কতটাই না দুর্ভাগা!.. ২৫৭
◈ এটা ফিরিয়ে আনতে পারলে দেখাও!.............................. ২৬০
◈ অনেক দূরে খোঁজার প্রয়োজন নেই! ২৬৪
◈ যতই উঁচুতে উঠো না কেন, তুমি একজন মানুষই! ২৬৮
◈ দুই ফোঁটা তেল!.. ২৭১
◈ পরিশিষ্ট... ২৭৩
◈ প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি! ২৭৫
◈ পাঠকের পাতা.. ২৭৮

সূচনা..

সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে এবং দরুদ ও সালাম আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি।

স্বাগতম আপনাকে প্রিয় পাঠক! যাকে আমি অন্তর থেকে ভালোবাসি। প্রতিবার যখন লিখতে বসি, তখন আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি— যেন কোনো পাঠককে হারাতে না হয়। কারণ, একজন লেখকের জন্য তার পাঠকদের হারানো এমন এক বেদনা, যা শোক প্রকাশেরই যোগ্য। তাই আমি নিজেকে সবসময়ই বেশি থেকে বেশি চেষ্টা, পরিশ্রম আর আন্তরিকতার বন্ধনে আবদ্ধ মনে করি।

যারা আমার লেখা প্রথমবার পড়ছেন, তাদের জন্য রইল হাজারো দুআ এবং হৃদয়ের গভীর থেকে শুভকামনা। আপনারা এই বইয়ের পাতায় পাতায় জ্ঞানের আনন্দ খুঁজে পান, এই কামনাই করি। আর আমার পুরোনো পাঠক বন্ধুদের উদ্দেশে বলব— এবারের যাত্রাটা কিন্তু আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক, অনে-ক বেশি ভিন্নরকম! এবার আমি আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলতে চাই এক ব্যক্তিগত ভ্রমণে—আমার নিজস্ব ভুবনে।

এই ভ্রমণে আমি আপনাদের যা উপহার দিচ্ছি, তা হলো একজন লেখকের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ; তার চিন্তা, তার ভাবনা, তার অভিজ্ঞতা এবং তার উপলব্ধির প্রতিফলন। এই লেখার প্রতিটি শব্দে রয়েছে আমার জীবনের স্বাদ, অভিজ্ঞতার ব্যথা, ভাবনার শিকার আর স্মৃতির দলিল।

এটি জীবনের কিছু গভীর মুহূর্ত, কিছু অর্থবহ অভিজ্ঞতা এবং কিছু বাস্তবতা তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। কখনো কোনো শোনা কথা, কোনো দৃশ্য কিংবা কোনো উপলব্ধি—যা হারিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল মনে, সেটাকে সযত্নে টুকে রেখে আপনার সামনে উপহার হিসেবে তুলে ধরা। **এটি এমন কিছু গল্প, যা জ্ঞান শেখায়, মনের আগুন জ্বালায়, এবং কাজে নামার ডাক দেয়।**

বইটিতে আমি চেয়েছি এমন কথাগুলোই তুলে ধরতে; যাতে চিন্তাশীল হৃদয়গুলো এর গভীরতা বুঝতে পারে এবং জ্ঞানপিপাসুরা সেখান থেকে জ্ঞানের আলো সংগ্রহ করতে পারে।

এই বই মূলত তৈরি হয়েছে— যারা গত হয়ে গেছে; তাদের জীবনের রস নিংড়ে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার উত্তাপে, আর সেই ভাবনার হাত ধরে— যা জীবন বিভিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে আমাকে শিখিয়েছে। তবুও, হঠাৎ করে মনে উঁকি মারে এক বিস্ময়কর ও কিছুটা উসকানিমূলক প্রশ্ন— **এই বইটা কি পড়ার মতো কিছু? নাকি এমন কিছু পৃষ্ঠা, যেগুলো পুড়িয়ে ফেলাই ভালো?**

লেখক ও প্রকৃত লেখক

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়—যখন আমি কেবল সেইসব 'বড় বড়' লেখকদের বইই পড়তাম, যাঁদের চিন্তার গভীরতা আমাকে অভিভূত করত। যাঁদের লেখার দৃঢ়তা আর দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা আমাকে এক অনন্ত মুগ্ধতায় ডুবিয়ে রাখত। তাদের আমি ভাবতাম একেকজন যেন প্রবাহমান বিশাল নদী—অথচ শান্ত, গম্ভীর, গভীর এবং সম্মোহনশক্তিতে পূর্ণ; যেখানে চিন্তার ঢেউ বয়ে চলে অবিরাম। তাদের সামনে অন্য সব লেখাই আমার কাছে ছিল যেন শুধু একেকটা মরা খাল কিংবা শুকনো নালার মতো—যেগুলোর পক্ষে কখনোই আমার মনোযোগ কেড়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

শিক্ষাজীবনের শুরুর দিক থেকেই আমার এক অদ্ভুত অভ্যাস গড়ে উঠেছে—আমি লেখকের অতীত খুঁজি। খুঁজি, তাঁর ভেতরে কোনো সংগ্রাম ছিল কি না, জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় তিনি নিজেই নেমেছিলেন কি না। তারপরই আমি তাঁর লেখা পড়তে বসি। কারণ, ফরাসি দার্শনিক হেনরি ডেভিড থোরো'র এই কথাটি আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি— **"যে ব্যক্তি জীবনকে সত্যিকার অর্থে অনুভব করেনি, তার লেখার টেবিলে বসাটা নিছক অর্থহীন।"**

তবে মজার ব্যাপার হলো, এই কথাটির প্রকৃত গভীরতা আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, যখন আমার পরিচয় হলো এমন কিছু লেখকের সঙ্গে—জীবনযুদ্ধে যাদের শির চির উন্নত। যারা আজও শত প্রতিকূলতাকে জয় করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, সংগ্রাম করে বাঁচছেন, আর সেই

সংগ্রামী জীবনের স্বাদই ছড়িয়ে দিচ্ছেন তাদের কলমে। এমন একটি কলম, যা ডুবে আছে লড়াইয়ের কালি-তে! তারা লেখেন আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা দিয়ে। আর সেই প্রতিভা অর্জন করেছেন তারা অসামান্য চেষ্টা, সাধনা আর অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে।

তখনই আমি স্থির করলাম—আমি হবো সেই মহামানুষদের বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র, এবং একই সঙ্গে সংগ্রামী মানুষদের একজন সহযোদ্ধা। কারণ আমি বুঝতে শুরু করেছিলাম, কেবল বড় বড় নাম বা তাত্ত্বিক চিন্তাই নয়—লেখালেখির পেছনে থাকে গভীর দায়বদ্ধতা, ত্যাগ, এবং এক অন্তর্জাগতিক বোঝাপড়া।

> **যে ব্যক্তি জীবনকে সত্যিকার অর্থে অনুভব করেনি, তার লেখার টেবিলে বসাটা নিছক অর্থহীন।**

আর এও বুঝলাম, লেখালেখি কতটা ভারী, কষ্টকর এবং দায়িত্বপূর্ণ একটি কাজ—এটি তো কেবল সেই লেখকই বুঝতে পারেন, যিনি উপলব্ধি করেন যে, এটি নিছক কোনো শব্দের খেলা নয়, বরং এটি একটি পবিত্র আমানত। এমন এক আমানত, যা কাঁধে তুলে নিতে হয় বিবেকের নির্দেশে, হৃদয়ের তাগিদে।

আবার এর উল্টো দিকও রয়েছে— কিছু “লেখক” আছেন যারা অমূল্য সাদা পৃষ্ঠাগুলো নষ্ট করেন এমন কিছু লাইন লিখে, যেগুলো না লিখলেই বোধহয় ভালো হতো। এই বাস্তবতা আমাকে ভীত করে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আমি যেন কখনো এদের কাতারে না পড়ি।

১

ভাবনা আসলে এক ধরনের রিজিক

যেটা আল্লাহ আমাদের কাছে পাঠান!

> **প্রজ্ঞা যেন এক পাখি, আর কলম হলো তার শিকারি।**

প্রিয় পাঠক! আমাদের মনে কত ভাবনা, কত বুদ্ধিদীপ্ত কথা, কিংবা দারুণ দারুণ কত পরিকল্পনা এসে যায়, কিন্তু সেগুলো আবার হারিয়ে যায় জীবনের ব্যস্ততা, ক্লান্তি-অলসতা আর অমনোযোগিতার ভিড়ে। ভাবনাগুলো যেমন হঠাৎ করে আসে, তেমনি হারিয়েও যায় হঠাৎ-ই। মনে থাকে না, লেখা হয় না—শুধু থেকে যায় এক ঝলক আলো হয়ে।

তাই চিরকালই গুরুজনেরা, শিক্ষকরা, জ্ঞানী মানুষেরা তাঁদের শিষ্যদের বলে গেছেন— **তোমার সঙ্গে যেন সবসময় ছোট্ট একটা খাতা থাকে, যেখানে তুমি লিখে রাখবে তোমার মনে উদয় হওয়া যেকোনো চিন্তা, যেকোনো প্রশ্ন অথবা যে কোনো পরিকল্পনা; যা ধীরে ধীরে বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছে। কারণ, ভাবনা আসলে এক ধরনের রিজিক— যেটা আল্লাহ আমাদের কাছে পাঠান।** এটাকে অবহেলা করা, বা এটার সাথে হেলাফেলা আচরণ করা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আজ যে ভাবনাটা আপনার দরজায় কড়া নাড়ল, তা হয়তো বাস্তব হবে বছর দশেক পর। কিন্তু সেটা যদি আপনার খাতার পাতায় বন্দী না

থাকে, আপনি যদি সেই সুন্দর চিন্তাটাকে আজই সংরক্ষণ না করেন, তাহলে সেই সময় আসার পর হয়তো আপনি আর কিছুই মনে করতে পারবেন না। ঠিক যেমন কেউ রান্নার হাঁড়ি ভেঙে ফেলল, মাংস নেই বলে। পরবর্তীতে যখন মাংস জোগাড় হল, তখন হাঁড়ি না থাকার কারণে মাংস আর রান্নাই করতে পারল না! এই কারণেই আমি আমার কথার শুরুটা এই ছোট্ট পরামর্শটি দিয়েই করতে চাইলাম; যাতে আপনি এই অভ্যাসটা আজ, এখন থেকেই গড়ে তুলতে পারেন।

প্রিয় পাঠক! এই বইয়ের পাতায় পাতায়—আপনি এমন কিছু কথা পাবেন, যা আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে, নতুন কোনো ভাবনা এনে দেবে, অথবা হয়তো কোনো পরিকল্পনার বীজও বুনে দেবে আপনার সুপ্তমনে। আবার এমনও হতে পারে—কোনো একটি লাইন আপনাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করবে, কিংবা আপনার বিশ্বাসে কাঁপুনি ধরিয়ে দেবে। হয়তো কোথাও আপনি সহমত হবেন না, বরং বিরোধ বা সংশয়ও জন্ম নিতে পারে। কিন্তু সেটাই তো লেখা ও লেখকের সার্থকতা—পাঠকের মনে আলো জ্বালানো, প্রশ্নের সূত্রপাত ঘটানো, অথবা অন্তত চিন্তার দরজাটা একটুখানি খোলা রাখা।

প্রিয় পাঠক! এই কারণেই বইয়ের শেষে আমি **তিনটি খালি পৃষ্ঠা** রেখেছি **শুধু আপনার জন্য—**যাতে সেখানে আপনি লিখে রাখতে পারেন আপনার চিন্তাভাবনা, আপনার কলমের শিকার এবং আপনার মনের কোণে উঁকি দেওয়া চোরাপ্রশ্নগুলো। এমনকি আপনি চাইলে তাতে প্রতিটি অনুচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসারও লিখে রাখতে পারেন এক বা একাধিক লাইনে।

এতে পরবর্তীতে যখন আপনি বইটি হাতে নিবেন, রিভাইস করবেন, আবার দেখবেন; তখন খুব দ্রুতই চোখ বুলিয়ে আপনি মনে করতে পারবেন—বইয়ের কোন কোন যাত্রায় আমরা কী কী বলেছিলাম, আর এটা হয়ে উঠবে আপনার নিজস্ব ভঙ্গিতে একরকম একটা ছোট্ট উপসংহার!

২

আপনার সাফল্যের গল্পগুলো ওদেরকেই বলতে দিন!

প্রিয় পাঠক, অহংকার, আত্মপ্রশংসা, এবং আত্মকেন্দ্রিকতা— এই তিনটি ব্যাধি একজন মানুষের জীবনকে প্রজ্বলিত নরকে পরিণত করতে পারে। যারা এই রোগে আক্রান্ত, তারা কখনোই শান্তির জীবন উপভোগ করতে পারেন না। তারা সেই সুখের স্বাদ কখনোই পান না— যা অনুভব করেন তারা, যারা জীবন যাপন করেন নিঃস্বার্থভাবে, বিনয়ের সাথে এবং সরলতায়।

এই "আমি-আমি" ভাব— এই ভেতরের কর্কশ কণ্ঠস্বর, যেটা সবসময় চায় সবাই যেন আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়, এটা এক রকমের দুঃখজনক অসুস্থতা। এটা সেই আত্মপ্রবঞ্চক ইন্ধন— যেটা আমাদের ঠেলে দেয় বারবার প্রমাণ করতে যে, আমি অন্যদের চেয়ে ভালো, আমি দেখতে সুন্দর, আমি বেশি ধার্মিক, আমি বেশি সম্মানিত, আর সাফল্যের দিক থেকেও আমি অন্যদের ছাপিয়ে গেছি। কিন্তু আসলে, **এটা একটা মনের অসুখ মাত্র।**

প্রিয় পাঠক, এই ধ্বংসাত্মক প্রবণতাটি ব্যক্তির মানসিক কাঠামোর গভীর এক অসাম্যতা বোঝায়, যা উপশমের জন্য প্রয়োজন নিজের সঙ্গে কিছু সত্যিকারের মুহূর্ত, কিছু গভীর আত্মসমীক্ষা। **আর নিয়তির ন্যায্যতায় তো রয়েছে এর এক অদ্ভুত পরিণতি—অহংকারী মানুষ সবসময় একটা মানসিক চাপে থাকে। সে ভয় পায়, যদি অন্যরা একদিন জেনে যায়—সে**

আসলে যতটা বড়াই করে, ততটা নয়। আর সেই ভয় ঢাকতে গিয়ে সে আরও বেশি নিজেকে প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

অহংকারী মানুষ ব্যস্ত থাকে নিজের দুর্বলতাকে আড়াল করতে। সে নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো ঢেকে রাখতে চায়। আর নিজের গুণগুলোকে এতটাই বাড়িয়ে বলে, যাতে সবাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে—সে ঠিক তেমনই, যেমনটা সে নিজেকে বলে।

এর একেবারে বিপরীত চিত্র হলো বিনয়ী মানুষটির। সে নিজের মহৎ গুণগুলোকে ঢেকে রাখে তার বিনয়ের বালুকাবেলায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ একসময় আবিষ্কার করে—এই মানুষটির মাঝে কী অসাধারণ গুণাবলি'ই না আছে! তখনই তারা অনুভব করে তার ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব, তার চরিত্রের সৌন্দর্য!

প্রিয় পাঠক, এটা ঠিক যে, মানুষ মাত্রই চায় প্রশংসা, চায় সম্মান। কিন্তু সেই হৃদয়, যেটাকে হৃদয়বান ব্যক্তি নিজে নিয়ন্ত্রণ করেন, যিনি প্রতিদিন নিজেকে ছোট ভেবে অন্যকে বড় হিসেবে দেখতে চান—সেই হৃদয়ই সত্যিকারের শান্তি অনুভব করতে পারে। যে মানুষ নিজের অহংবোধকে দমাতে পারে, নিজের ভেতরের গর্বকে থাপ্পড় মেরে জাগিয়ে তুলতে পারে বিনয়ের আলো—সে কখনো নিজের প্রশংসায় মুখ খোলেনা। **তার কাজই তার হয়ে কথা বলে। তার প্রতিটি অর্জন যেন বলে— "এই মানুষটা তো সত্যিই মহান!"**

> **এর একেবারে বিপরীত চিত্র হলো বিনয়ী মানুষটির। সে নিজের মহৎ গুণগুলোকে ঢেকে রাখে তার বিনয়ের বালুকাবেলায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ একসময় আবিষ্কার করে—এই মানুষটির মাঝে কী অসাধারণ গুণাবলি'ই না আছে! তখনই তারা অনুভব করে তার ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব, তার চরিত্রের সৌন্দর্য!**

৩

জীবনটা উপভোগ করুন

অযথা আগুনে পুড়বেন না!

স্টিফেন লিকক একবার বলেছিলেন, "জীবন কতই না অদ্ভুত!"

শিশু ভাবে— "আমি বড় হলে জীবন বুঝি আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।"

তরুণ ভাবে— "যুবক হলে সবকিছু আমার আয়ত্তে থাকবে।"

যুবক বলে— "যখন আমি বিয়ে করব, তখনই জীবন হবে পরিপূর্ণ।"

আর যখন সে বিয়ে করে ফেলে, তখন ভাবে— "দায়িত্বমুক্ত হলেই বুঝি শান্তি মিলবে।"

এইভাবে জীবনের প্রতিটি ধাপে মানুষ ভবিষ্যতের আশায় "আজ"কে ভুলে যায়। আর যখন বার্ধক্য নীরবে এসে দাঁড়ায় দরজায়, তখন সে পেছনে তাকিয়ে দেখে—পুরো জীবনটাই যেন কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেছে, ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে সবকিছু!

প্রিয় পাঠক, **জীবনের আসল মানে আমরা তখনই বুঝতে পারি, যখন প্রায় সব শেষ।** অথচ আমাদের প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা, এবং প্রতিটি সেকেন্ড উপভোগ করার মাঝেই তো জীবন। যেটুকু সময় আমরা সত্যিই উপভোগ করতে পারি, তা হলো এই মুহূর্তটি—এখন। কারণ, গতকাল শেষ হয়ে গেছে। আগামীকাল—তার আসার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের হাতে আছে শুধু আজ। আমরা চাইলে এটাকেই উপভোগ করতে পারি।

কিন্তু বাস্তবতা কী? বাস্তবতা হলো, আমরা দিনের অর্ধেকটা কাটাই—পেছনের ভুল আর অতীতের আক্ষেপে। এবং বাকি অর্ধেকটা কাটাই—ভবিষ্যতের ভয় আর দুশ্চিন্তায়। এইভাবে আমাদের পুরো জীবনটাই হারিয়ে যায়। পেছনের সমস্যাগুলোর দুশ্চিন্তায় আর সামনের অনিশ্চয়তার দোলাচলে স্বপ্নগুলো আমাদের হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যায়, যেমন করে ঝরে পড়ে শুকনো বালির কণা।

> **যেটুকু সময় আমরা সত্যিই উপভোগ করতে পারি, তা হলো এই মুহূর্ত—এখন। কারণ, গতকাল শেষ হয়ে গেছে। আগামীকাল—তার আসার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের হাতে আছে শুধু আজ। আমরা চাইলে এটাকেই উপভোগ করতে পারি।**

প্রিয় পাঠক, আমাদের অনেকেই জীবনকে এমনভাবে কাটান, যেন এটা শুধু একটি মহড়া মাত্র, আর “আসল জীবন” আসছে কিছুদিন পরে। কিন্তু পার্থিব এই জগতের নির্মম সত্যটা হলো, **আমাদের হাতে আছে কেবল এই মুহূর্তটাই। এই মুহূর্তই হলো আমাদের বাস্তব জীবন। এটাই আমাদের আসল সময়। আমরা যদি একটু খেয়াল করি, তবে বাঁচতে পারি প্রশান্তিতে—সুখে।**

আমাদের প্রিয়নবী ﷺ অত্যন্ত মূল্যবান ও গভীর একটি বিষয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এক হাদিসে তিনি ﷺ ইরশাদ করেন: ***“যে ব্যক্তি সকাল বেলা নিজের বাসস্থানে নিরাপদ থাকে, তার দেহ সুস্থ থাকে, আর এক দিনের খাবারসমপরিমাণ তার কাছে থাকে—তাহলে পুরো পৃথিবীর সব কিছুই যেন তার হয়ে গেছে।”***

এই হাদীসটিকে সামনে রেখেই শায়খ মুহাম্মাদ আলগাযালী (রহ.) একটু ভিন্নভাবে বলেছেন: ***“নিরাপত্তা, সুস্থতা আর একদিনের প্রয়োজনীয়তা—এই তিনটি জিনিসই যথেষ্ট একজন শান্ত, স্বচ্ছমনের***

৪

যতটা সম্ভব, শুধু ততটাই করুন

কেউই জীবনের সব কাজ শেষ করে মরেন না!

প্রিয় পাঠক! আপনি কি সর্বক্ষণ ব্যস্ত? মনে হয় যেন নিশ্বাস নেওয়ার সময়টাও হাতে নেই? আপনার কর্মতালিকা ভর্তি বিভিন্ন ব্যস্ততা, দায়িত্ব, আর পরিকল্পনায়? শুধু চাপ আর চাপ? আপনি কি মাঝে মাঝে ভাবেন—"একবার সব কাজ শেষ করতে পারলে বুঝি শান্তি পাবো, স্থির হতে পারব? এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব?" শুনুন প্রিয় ভাই আমার! আপনার এ ভাবনাটা আসলে এক মরীচিকা মাত্র। সব কাজ শেষ করার পর যে স্থিরতা; সেটা আসলে কখনো আসবেই না!

আপনি নিশ্চয়ই অনুভব করেন, যত কাজই শেষ করেন না কেন, নতুন কাজ যেন একের পর এক সারি দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। একটা শেষ না হতেই আরও দশটা কাজ চলে আসে। আবার প্রতিটা কাজই এমন; যার জন্য দরকার প্রচুর সময়, শ্রম আর ধৈর্য! তখন হয়তো আপনার মনে হয়—এর শেষ কোথায়? শান্তি আসবে কবে?

শুনুন, প্রিয় ভাই! সত্যি কথা বলতে, শান্তি কোনো কাজের "শেষে" নয়, শান্তি লুকিয়ে আছে আপনার ভেতরেই। কারণ দেখুন, আপনি যতই কাজ করেন, কাজ ততই বেড়ে চলে। বিশ্রাম আসে না, বরং দায়িত্বের ভার বেড়ে যায় আরও। এই ছুটে চলা, এই "সব কাজ শেষ করতে হবে"

চিন্তা—এটা কেবল আপনাকে ক্লান্ত করেই তুলবে। আপনার প্রাণশক্তি, আনন্দ, নিজের জন্য সময়—সব কিছুই খেয়ে ফেলবে।

বাস্তবতা হলো—একজন দায়িত্বশীল মানুষের কাজ কখনোই একেবারে শেষ হয় না। যতদিন আপনি বেঁচে আছেন, ততদিন চলতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে—এটাই জীবন। আপনি দেখবেন, একজন ক্রিয়েটিভ মানুষ কখনোই একেবারে ফাঁকা থাকেন না। শূন্যতা আর স্থবিরতা তো কেবল অলস ও মৃতদের জন্য! **তাই আপনাকে শিখতে হবে কিভাবে চাপের মাঝেও শান্ত ও শান্তিতে থাকা যায়।** কাজের তালিকা শেষ না করেও কিভাবে মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখা যায়।

> **মনে রাখবেন, আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) ব্যতীত আর কেউই জীবনের সকল কাজ শেষ করে মরেন না। আমাদের অনেক স্বপ্ন, অনেক কাজ অপূর্ণই থেকে যায়— যা হয়তো একদিন বাস্তবায়ন করবে আমাদের সন্তানেরা, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।**

তাই থামুন! একটু গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিন। এত দৌড়াদৌড়ির মাঝে জীবনের সৌন্দর্যটা যেন হারিয়ে না যায়। আপনি যদি কেবল কাজের মাঝেই ডুবে থাকেন, তবে একসময় আপনি নিজের ভেতরের মানুষটাকেই তো হারিয়ে ফেলবেন।

হ্যাঁ, কাজ করতে হবে—কিন্তু ধীরে ধীরে, ধৈর্যের সাথে, লক্ষ্য ঠিক রেখে। **যতটা সম্ভব, শুধু ততটাই করুন।** নিজেকে এমন দায়িত্ব দেবেন না, যা আপনার সাধ্যের বাইরে। **আপনার রব, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি বলেন: *“আল্লাহ কাউকেই তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।”* — সুরা আল-বাকারাহ (২:২৮৬) তবে আপনি কেন নিজের উপর অতিরিক্ত**

৫

চলুন, নিজের মৃত্যুসংবাদটা লিখে ফেলি!

প্রিয় পাঠক, চলুন, একটি কাগজ আর একটি কলম নিয়ে আসুন— আর লিখে ফেলুন আপনার নিজের মৃত্যুসংবাদ! কি? অবাক হলেন? হ্যাঁ, হতেই পারেন। তবে কথাটা শুনতে কেমন অশুভ অশুভ লাগলেও, বিশ্বাস করুন, এর ভিতরেই লুকিয়ে আছে জীবনের এক গভীর বার্তা।

এই বিষয়ে একটি ঘটনা খুবই প্রাসঙ্গিক। একজন সম্মানিত বুজুর্গ ছিলেন, তিনি মাঝে মাঝেই কবরের মতো একটি গর্তে বসে পড়তেন, আর বলতেন— "হে প্রভু! আমাকে আবার ফিরিয়ে দাও, যাতে আমি ভালো কিছু করতে পারি।" তারপর তিনি নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকেই বলতেন— "এই তো, ফিরে এলে! এবার বলো, কী করবে?"

প্রিয় পাঠক, তিনি নিজেকে কল্পনা করতেন একজন মৃত মানুষের মতো—যে তার আমলনামা হাতে নিয়ে মহান প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান। একজন মানুষ, যার চোখের সামনে শেষ মুহূর্তে ভেসে ওঠে তার পুরো জীবনের দৃশ্যপট—সমস্ত ঘটনা... সমস্ত স্মৃতি... সমস্ত ভুল... সমস্ত ভালোবাসা... এবং সবকিছু।

তখন তার মনে হয়— "ইস! যদি সময় থাকতো, তাহলে এই অংশটা একটু ঠিক করে নিতাম, আরও কিছু ভালো কাজ করে যেতাম।" তার খুব ইচ্ছে হয়— ইস্! জীবনের সেই যাত্রাপথে যদি আরও কিছু আলো ছড়িয়ে দিয়ে যেতাম, আরও একটু গাঢ় রঙে লিখে যেতে পারতাম জীবনের গল্পটা!

৬

জীবন কোনো জরুরি অবস্থার নাম নয়!

লাইফ ইজ নট অ্যান ইমার্জেন্সি!

প্রিয় পাঠক! ইচ্ছে করে দুনিয়ার প্রতিটি দেয়ালে, প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি অফিসে এবং প্রতিটি ঘরে ঘরে এই কথাটা বিশাল অক্ষরে লিখে দিই—"জীবন কোনো জরুরি অবস্থার নাম নয়!"

কারণ, অনেকেরই মনে হয়—জীবনের নানা দায়-দায়িত্ব, পেশাগত চাপ, হঠাৎ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা, সব মিলিয়ে যেন তারা এক বিশাল টাইমবোমার ওপর বসে আছেন। একটুখানি দেরি বা ভুলচুক হলেই বুঝি সব কিছু উড়ে যাবে—স্বস্তি, শান্তি, এমনকি মানসিক স্থিতিও। কিন্তু সত্য কথা হলো, তাদের এ দুশ্চিন্তা পুরোপুরিই অমূলক; এই আতঙ্ক আমাদের বাস্তবতা নয়, বরং এটি এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপ, যা আমরা নিজেরাই তৈরি করে ফেলি।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে—নিজের দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি পালন করা জরুরি। কিন্তু আমাদের এটাও বোঝা উচিত—প্রত্যেক মানুষেরই একটা সহ্যসীমা আছে, আছে একটা শক্তির পরিধি। যখন কেউ নিজেকে সেই সীমার বাইরে ঠেলে দেয়, নিজের শক্তির চেয়ে বেশি কাজ করতে বাধ্য করে নিজেকে, তখন সেটাই ফিরে এসে ধ্বংস করে তাকে—তার মনকে, তার শরীরকে, এবং তার পুরো জীবনটাকে।

যেমন আমার এক বন্ধু একদিন কথায় কথায় বলেছিল— "বন্ধু! *একটা প্রজেক্টের সফলতার পেছনে আমি এতটাই দৌড়েছি, যেন আমি একটা বাঘ পালছি! আর এখন সেই বাঘ'ই আমাকে কামড়াচ্ছে—রাত-দিন তাড়া করে ফিরছে!"*

প্রিয় পাঠক! আমরা সবাই'ই কোনো না কোনো সময় ঠিক এই মানুষটির মতোই হয়ে উঠি। আমরা ছুটছি, দৌড়াচ্ছি, দিনরাত একাকার করে পরিশ্রম করছি, শেষ করতে চাই স-ব কাজ; **এই আশায় যে—একবার সব কাজ শেষ করতে পারলে হয়তো কিছুটা শান্তি পাবো!** কিন্তু বিশ্বাস করুন, সব কাজ কখনো শেষ হবে না, আর আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত বিশ্রামও কোনোদিন আসবে না।

এটাই জীবনের প্রকৃতি। তাকে বুঝতে হবে, মেনে নিতে হবে—তবেই আমরা তা উপভোগ করতে পারবো, না হলে জীবন হয়ে উঠবে শুধু এক অবিরাম দৌড়ের মাঠ—যেখানে থাকবেনা থেমে দাঁড়ানোর সুযোগ, থাকবেনা কোন গভীর উপলব্ধি।

> **আমাদের সমস্যা হল, আমরা মাঝে মাঝে সাধারণ জিনিসকেও জরুরি দায়িত্ব বানিয়ে ফেলি, আর তা সম্পন্ন করতে না পারলে নিজেই নিজেকে শাস্তি দিতে থাকি! ভাই! জীবনের এই দৌড় থামান! একটু নিঃশ্বাস নিন! নিজেকে ক্ষমা করুন! ক্লান্তশ্রান্ত হৃদয়কে একটু বিশ্রাম দিন। আপনার মনের দরজায় নরম করাঘাত করে বলুন— "চলো, একটু বিশ্রাম নিই।" জীবনটা উপভোগ করুন। আপনার শরীর আর মনেরও তো একটা দাবি আছে—একটু অবকাশের, একটু নির্মল হাওয়ার স্পর্শের, আর একটা সজীব নিঃশ্বাসের যেটা হিসেবের বাইরে। তাই না?**

৭

এই জীবনে আমি অনেক কিছু পেয়েছি!

প্রিয় পাঠক! নেওয়ার আনন্দ তো সবাই জানেন, কিন্তু দেওয়ার আনন্দ? তা জানেন কেবল মহৎ হৃদয়ের মানুষরা, যাদের হৃদয় বড়, যারা সত্যিকার অর্থেই মহান।

সেই মহৎ মানুষদেরই একজন, সাইয়েদ কুতুব (রহ.) বলেছিলেন: **"এই জীবনে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। মানে, আমি অনেক কিছু দিয়েছি।"** তাঁর এই কথায় যেন দেওয়া আর পাওয়া মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অবশ্য আত্মার জগতে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু খুব একটা বেশিও নয়। যে দেয়, সে-ই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পায়—মানসিক শান্তি, হৃদয়ের প্রশান্তি, আর পরম তৃপ্তি।

তিনি আরো বলেন, **প্রতিবার যখন আমি কিছু দিয়েছি, কিছু না কিছু ফিরে পেয়েছি। কেউ আমাকে কিছু দেয়নি, তবুও আমি পেয়েছি— পেয়েছি ঠিক সেই আনন্দ, যা কোনো একজন পেয়েছে আমার দেওয়া উপহারে।"**

> **দেওয়ার স্বাদ তো কেবল তারাই জানে—যাদের হৃদয়ে আলো আছে, যারা হৃদয়ের রাজা।**

প্রিয় পাঠক! বাস্তবেই দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ লুকিয়ে থাকে, তা কখনো চাওয়ার মধ্যে মেলে না। কারণ দেওয়ার যে আনন্দ, সেটা তো

নিঃস্বার্থ, নিখাদ আত্মিক এক আনন্দ, যা জুড়িয়ে দেয় আপনার মন এবং প্রাণ। আর নেওয়ার আনন্দ? সেটা তো কেবল ক্ষণিকের এক বস্তুগত অনুভূতিমাত্র।

তাই বলি, আপনি যদি সত্যিকারের সুখ খুঁজে পেতে চান—তবে কাউকে কিছু হাদিয়া দিন, হৃদয় থেকে, ভালোবাসা দিয়ে, এবং উদার হয়ে। কারণ সেই মিষ্টি হাসি, চোখের সেই উজ্জ্বলতা—যা আপনি সৃষ্টি করবেন আপনার দানের মাধ্যমে—এটাই আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

জর্জ বার্নার্ড শ এক চমৎকার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন,

> **জীবনের আসল আনন্দ তখনই আসে, যখন আপনি আপনার শক্তি উৎসর্গ করেন অন্যের সেবায়। তখন নয়, যখন আপনি কেবল অভিযোগ করেন—কেন পৃথিবী আমার সুখের জন্য কিছু করছে না!**

প্রিয় পাঠক! যখন আপনি নিয়মিত দিতে শুরু করেন, তখন ধীরে ধীরে আপনার ভেতরে জন্ম নেয় এক অলৌকিক অনুভূতি—যেন মহান প্রভুরই কোনো গুণ আপনি নিজের মধ্যে ধারণ করছেন। আপনি হয়ে উঠেন দান, উদারতা আর করুণায় উদ্ভাসিত এক আলোকিত সত্তা।

তাই আপনিও হাতে তুলে নিতে পারেন শ্রেষ্ঠ আনন্দের চাবিকাঠি—"দানের আনন্দ।" কারণ উত্তম সেই হাত যে দেয়, যে পায় সে নয়। এই "দানশীল হাত"-ই পারে আপনাকে মুক্ত করতে জড়তা আর স্বার্থপরতার খাঁচা থেকে—এবং নিয়ে যেতে পারে আত্মার বিশাল আকাশে।

> **প্রিয় পাঠক! সবাই চায় জমাতে, রাখতে, আঁকড়ে ধরতে। কিন্তু আপনি যদি নিজেকে "দিতে" শেখাতে পারেন—তাহলে**

৮

এই সমাজ, এই পরিবেশ, এই মানুষগুলোই কি আমার ব্যর্থতার মূল কারণ? নাকি..!

প্রিয় পাঠক, আমরা প্রায়ই ভাবি—সমস্যা আমার নয়, আমার চারপাশটাই আসলে দায়ী। এই সমাজ, এই পরিবেশ, এই মানুষগুলো; যেন তারাই আমাদের ব্যর্থতার মূল কারণ। এই চিন্তার পেছনে আসলে রূপক একটা স্বস্তি আছে, আছে দায় এড়ানোর একধরনের সহজ পথ। তাই হঠাৎ একদিন মনে হয়—সব ছেড়ে পালিয়ে যাই এমন কোথাও, যেখানে কেউ চিনবে না, জানবে না—যেখানে নতুন করে শুরু করব আবার সবকিছু।

> **ভাবতে থাকি—জীবন বদলাবে, যদি জায়গাটা বদলে যায়, যদি মানুষগুলো বদলায়, জানালার বাইরের দৃশ্যটাও যদি বদলায়—তাহলেই বুঝি আমি নতুন করে গড়ে উঠতে পারব!**

কিন্তু প্রিয় ভাই আমার! বাস্তবতা অনেক বেশি নির্দয়, অনেক বেশি নির্মম। হয়তো সত্যটা সম্পূর্ণই উল্টো। কারণ সমস্যা যে অন্য জায়গায়! আপনার ভেতরেই! আপনি যেখানেই যান না কেন, নিজের ভেতরের মানুষটাকেও তো সঙ্গে নিয়ে যান। আর সেই মানুষটা যদি এখনো পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি, পুরোনো ভয় এবং পুরোনো দিনের সেই সংশয় সন্দেহেই আচ্ছন্ন থাকে, তাহলে আপনার নতুন জায়গাটাও পুরোনো ক্লান্তি দিয়ে ভরে যাবে নিশ্চিত।

> **আসলে পরিবেশ নয়, বদলানো দরকার আপনার দৃষ্টিভঙ্গি। সেই চোখ, যে শুধু সমস্যাকেই দেখে—সম্ভাবনাকে নয়। সেই মন, যে প্রতিবার হেরে গিয়ে পালানোর পথ খোঁজে—লড়াইয়ের নয়। কারণ পালিয়ে গেলে কেবল দৃশ্যপট বদলায়, গল্পটা নয়।**

প্রিয় পাঠক, জীবনের অনস্বীকার্য বাস্তবতা হলো, আমরা প্রায়ই নিজের সঙ্গে সত্যি করে কথা বলতে ভয় পাই। তাই পরিবেশকে দোষ দিই। নিজের কষ্ট, অলসতা এবং অচলাবস্থার দায় চাপিয়ে দিই সময়ের ঘাড়ে। বলি— "সময়টা যদি আরেকটু ভালো হতো... যদি একটু অন্য জায়গায় থাকতে পারতাম... আহ! এখানকার মানুষগুলো যদি আরেকটু ভালো হতো।"

কিন্তু সত্যটা হলো, আপনি যদি এখন, এই অবস্থান থেকেই নিজেকে বদলাতে শুরু না করেন, তবে কখনোই পারবেন না। কারণ জীবন এমন কিছু নয়, যা কোনো নির্দিষ্ট সময় বা জায়গার অপেক্ষায় বসে থাকে। বরং কাঙ্খিত পরিবর্তনের যাত্রাটা শুরু হয় ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে, যখন আপনি সিদ্ধান্ত নেন— **"আমি বদলাবো।"**

প্রিয় পাঠক! আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমি নিজেও একসময় এই ধারণার বন্দী হয়ে পড়েছিলাম—ভাবতাম, আমার সমস্যাগুলোর সমাধান লুকিয়ে আছে আমার চারপাশের বাস্তবতায়। যে সমাজে আমি বাস করি, যে পরিবেশে আমি নিঃশ্বাস নিই—সেই সব কিছু বদলালেই বুঝি আমি নতুন করে জেগে উঠতে পারব। এই সময়, এই জায়গা, এই পরিস্থিতিটা যদি একটু বদলায়—তাহলেই আমি হবো ভালো, সফল, এবং সুখী!

৯

উদ্ধারকারী নিঃশ্বাস

এক নির্মল প্রশান্তির পাঠ

প্রিয় পাঠক! জীবনে চলার পথে আপনি নিশ্চয়ই কখনো এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, যখন কারো বলা একটি কঠিন কথা এসে বিঁধে গেছে আপনার মনে। হয়তো কাছের কোনো মানুষ, যাকে আপনি ভেবেছিলেন আপনজন, তার মুখ থেকেই এসেছে সেই রূঢ় বাক্য। অথবা এমন কারো কাছ থেকে, যাকে আপনি খুব একটা গুরুত্ব দেননি—তার কথাও হঠাৎ আঘাত করেছে আপনার হৃদয়ের গভীরে।

এই কঠিন কথাগুলো কখনোই আসলে শুধু শব্দ হয়ে থাকে না, বরং তীরের মতো তারা এসে বিঁধে যায় মনের গহীনে। এতে আমরা ভীষণ কষ্ট পাই। ভেতরে ভেতরে জমতে থাকে ক্ষোভ, অভিমান আর যন্ত্রণা। এক সময় সেই যন্ত্রণার ভারে আমরা কেঁপে উঠি। আমাদের ভেতরে জেগে ওঠে এক ধরণের জেদ, এক অদম্য প্রতিক্রিয়া—তখন মন চায় সমস্ত সংযম ভেঙে পাল্টা জবাব দিয়ে দিই। চিৎকার করে জানিয়ে দিই, "আমিও পারি তোমার কথার উত্তর দিতে—তার চেয়েও কঠিন, তার চেয়েও শক্ত ভাষায়!"

সত্যিই তো, আমরা মানুষ। আমাদের হৃদয় আছে, অনুভব আছে। তাই যখন কেউ আমাদের কষ্ট দেয়, তখন মনে হয়—উত্তর না দিয়ে থাকব কেন? একটা পাল্টা আঘাত তো দিতেই পারি!

কিন্তু আপনি কি খেয়াল করেছেন—যখন সত্যিই আপনি সেই কড়া উত্তরটা দিয়ে ফেলেন, তখনও আপনার মনটা শান্ত হয় না? রাগ কিছুটা হালকা হতে পারে, কিন্তু মনের গহীনে এক ধরনের শূন্যতা থেকেই যায়। আপনি যেন নিজের কাছেই নিজে হেরে যান। আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা সেই কঠোর শব্দগুলো শুধু অপরকেই আহত করে না, আপনাকেও ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে ভেতর থেকে। রাগের মুহূর্তে যে শক্তি আপনাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তা স্তিমিত হয়ে গেলে পেছনে রয়ে যায় শুধু এক নিঃশব্দ হাহাকার মাত্র।

শান্তি তখন আর ফিরে আসে না। বরং একরকম অপরাধবোধ, হতাশা আর আত্মঅভিযোগ গুমরে গুমরে উঠতে থাকে মনের গভীরে। আপনি হয়তো কারও চোখে কঠিন হতে পারেন, কিন্তু নিজের ভেতরে আপনি তখন সবচেয়ে বেশি ভাঙা, সবচেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন।

তাহলে সমাধান কি? সমাধান হলো, মনোবিজ্ঞানীরা বলেন—যখন কারো উপর রাগ হয়—তখন প্রথমেই ডেকে আনুন আপনার শরীরের নিঃশব্দ এক রক্ষীকে। তার নাম— "উদ্ধারকারী নিশ্বাস।" হ্যাঁ, আপনি ঠিকই পড়েছেন—এটি হলো একটি গভীর এবং ধীর শ্বাস। যা বুক ভরে অক্সিজেন নেয় আর রাগের আগুনকে প্রশমিত করে।

প্রিয় পাঠক! আপনি জানেন কি—শ্বাস নেওয়াটাও আসলে একধরনের শিল্প? শুনতে যতই সাধারণ মনে হোক, শ্বাস নেওয়া শুধু একটি শারীরিক প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি একটি গভীর, সচেতন অভ্যাসও, যা বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে আমাদের শেখা উচিত।

> **ব্যস্ত জীবনের ভিড়ে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই ঠিক করে শ্বাস নিতে। মানসিক চাপ, রাগ, ভয় কিংবা দুঃখ—সবকিছুই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসকে দ্রুত করে তোলে, এলোমেলো করে দেয় তার**